ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام

জন্ম, ঊর্ধ্বগমন ও প্রত্যাবর্তন

ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ

জন্ম, ঊর্ধ্বগমন ও প্রত্যাবর্তন

মূল
শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীন

অনুবাদ
জাবির মুহাম্মাদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭
ইমরান ﷺ-এর পরিবার ৯
মারইয়াম ﷺ ১৩
ঈসা ﷺ-এর জন্ম ২৪
মুজিযা ৫১
নাজরান ৫৯
হত্যার চক্রান্ত ৬৪
আসমানে উত্তোলন ৬৯
প্রত্যাবর্তন ৭৫
শান্তির সাত বছর ৭৯
রেফারেন্স ৮৪

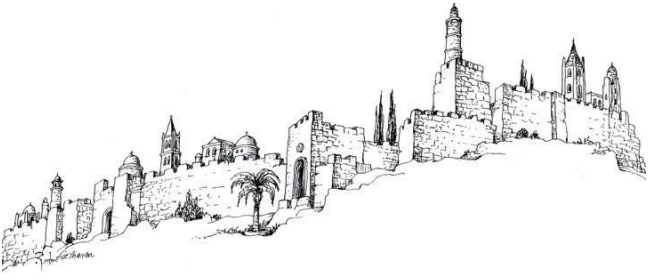

ভূমিকা

সম্প্রতি ঈসা ﷺ-এর জীবনী নিয়ে মিডিয়া ও পপুলার কালচারে অনেক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। ঈসা ﷺ-এর আশ্চর্য জীবন-কাহিনি ও মুজিযাগুলো নিয়ে নতুনভাবে মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সারাবিশ্বেই এটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে বিশ্বের প্রধান তিনটি ধর্মের ওপর, অর্থাৎ ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। দুনিয়ার ইতিহাসে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, এটা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে পেছনের ইতিহাস। তাঁর জীবনের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসকে নতুন রূপ দিয়েছেন এবং আবারও তা-ই করবেন কিয়ামাতের আগে দুনিয়াতে ফিরে এসে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঈসা ﷺ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এটা সহজেই অনুমেয়। তিনি শ্রেষ্ঠ রাসূলদের একজন। ইসলামে তাঁকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নবি ﷺ-এর আগে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তিনিই বানী ইসরাঈলের শেষ রাসূল। আল্লাহ ﷻ ঈসা ﷺ-এর পরিবারের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ কুরআনে মোট পঁচিশ বার ঈসা ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

আর তাঁর মা মারইয়াম ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেছেন একত্রিশ বার। উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ ﷺ অপেক্ষা ঈসা ﷺ-এর নাম কুরআনে বেশি এসেছে। কুরআনের দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। এমনকি ঈসা ﷺ-এর মা মারইয়াম ﷺ-এর নামে কুরআনে একটি পৃথক সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। ঈসা ﷺ-এর নানা-নানীর ব্যাপারেও কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। ঈসা ﷺ-এর নানা ছিলেন ইমরান। 'আ-লি ইমরান' বা ইমরানের পরিবারকে আল্লাহ্ সমস্ত মানবজাতির মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। তারা ছিলেন একটি মনোনীত বা বাছাইকৃত পরিবার। আল্লাহ ﷻ 'আ-লি ইমরান' নামে একটি পৃথক সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এই সূরাটিতেও ঈসার মা মারইয়াম ﷺ-এর কাহিনি আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, এ কয়েকটি তথ্য থেকে আমরা তাঁর বংশের উচ্চ মর্যাদা ও শৈশব জীবন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। ঈসা ﷺ-এর জন্মের বিশুদ্ধ কাহিনি জানার একমাত্র উপায়ও এটি।

কুরআনে ঈসা ﷺ-এর কাহিনি আলোচনা করা হয়েছে, এতটুকু তথ্য জানাই তাঁর জীবনের গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তাঁর জীবনের কাহিনি এসেছে, তবে কোথাও পুরো কাহিনি একত্রে বর্ণনা করা হয়নি। বরং একেকটি সূরায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে ঈসা ﷺ ও তাঁর মায়ের কাহিনি। আর বাকি অংশ বর্ণনা করা হয়েছে অন্য সূরাতে। এভাবে পাঠকের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা হয়েছে তাঁর উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, বংশ ও জীবনী সম্পর্কে।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

ইমরান ﷺ-এর পরিবার

বানী ইসরাঈলের মধ্যে অনেক আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। তারা ছিলেন খুবই ধার্মিক। ঈসা ﷺ-এর নানা ইমরানের পরিবার ছিল এমনই একটি পরিবার। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে নির্বাচিত করেছেন। তারা ছিলেন একে-অন্যের বংশধর। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।’[১]

ইমরান ﷺ ছিলেন একজন ইবাদাতগুজার মানুষ। তিনি ছিলেন দ্বীনদার, নিবেদিতপ্রাণ ও আল্লাহমুখী। দাউদ ﷺ-এর বংশধর ছিলেন তিনি। ইমরানের পরিবারের তাকওয়া বা পরহেযগারীর

[১] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৩-৩৪।

কারণে আল্লাহ তাদেরকে ও তাদের বংশধরদেরকে তৎকালীন সমাজের নানাবিধ গুনাহ ও মন্দ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ইমরানের স্ত্রী হান্নাহ বিনতু ফাকুদ ﷺ ছিলেন একজন বন্ধ্যা নারী। একদিন তিনি দেখলেন, একটি মা পাখি তার ঠোঁট দিয়ে ছানাদের মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে হান্নাহ'র মধ্যে মাতৃত্ববোধ জেগে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'হায়! আমারও যদি এমন সন্তান থাকত!' কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এটা ছিল অসম্ভব। কারণ, সন্তানধারণের বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছেন তিনি। তবুও তিনি আশা হারাননি। আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যেন তাঁকে একটি সন্তান দেয়া হয়। আর আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ডাকে সাড়া দিয়েই থাকেন! আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন আর বললেন, 'কুন ফায়া কুন!' মানে, কোনো কিছু ঘটানোর জন্য আল্লাহ ﷻ শুধু বলেন, 'হও, আর তা হয়ে যায়!'

একদিন ইমরানের স্ত্রী তাঁর গর্ভে শিশুর নড়াচড়া অনুভব করলেন! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি ওয়াদা করলেন, এই সন্তানকে আল্লাহর দ্বীনের খিদমতে উৎসর্গ করবেন তিনি।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'(আর স্মরণ করুন!) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে, তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম, দুনিয়ার সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।'[২]

[২] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৫।

ইমরানের স্ত্রী মনে-মনে চেয়েছিলেন, তাঁর যেন একটি পুত্র-সন্তান হয়। তাহলে এই সন্তানকে তিনি মাসজিদুল আকসার খিদমতে বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন। এই মাসজিদ ছিল জেরুজালেমে। আর জেরুজালেম ছিল ইবাদাত-বন্দেগির কেন্দ্রস্থল, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এলাকা।

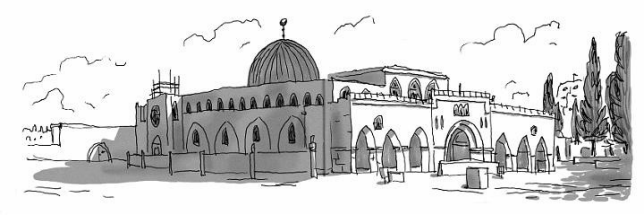

তখনকার যুগে এটাই রীতি ছিল যে, ওখানকার শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মানুষদেরকে মাসজিদুল আকসার খিদমতে নিযুক্ত করা হতো। তবে শুধুমাত্র ছেলেরাই নিয়োজিত হতে পারত এই কাজে। এর অনেক কারণও ছিল। প্রধান কারণ, ওখানকার পরিবেশ ছিল পুরুষদের অনুকূলে। বিভিন্ন সামাজিক বৈঠক ও কাজে পুরুষরা তাদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এছাড়া নারীরা সার্বক্ষণিকভাবে মাসজিদের খিদমতে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, নারীসুলভ অসুস্থতার সময় তারা ঐসব ইবাদাতের স্থানে থাকতে পারবে না। অথচ মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। এছাড়া যিনি বাইতুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তাকে সবসময় মাসজিদের ভিতরে থাকতে হবে, অথবা মাসজিদের কাছে কোথাও থাকতে হবে। যা একজন নারী-তত্ত্বাবধানকারীর নিরাপত্তার জন্য অনুকূল নয়।

সন্তান প্রসবের পর হান্নাহ দেখলেন, তিনি একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছেন!

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

‘অতঃপর যখন তাকে প্রসব করল তখন বলল, হে আমার রব! আমি তো একটি কন্যা প্রসব করেছি! বস্তুতঃ সে কী প্রসব করেছে, আল্লাহ তা ভালোই জানেন। সেই কন্যার মতো কোনো পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য আপনার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম।’[৩]

‘কন্যা-সন্তানকে দিয়ে কীভাবে মানত পূরণ হবে’—এটা ভেবে হান্নাহ ঘাবড়ে গেলেন! কিন্তু আল্লাহ ﷻ জানতেন, এই কন্যাই ছিল তার জন্য সর্বোত্তম। এটাই ছিল আল্লাহর পরিকল্পনা। তিনি হান্নাহ’র সেই কন্যা-সন্তানকেই বাইতুল মাকদিসের প্রথম নারী তত্ত্বাবধানকারী বানাতে চেয়েছিলেন। সেই মেয়ের নাম ছিল মারইয়াম ﷺ!

[৩] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৬।

মারইয়াম عليها السلام

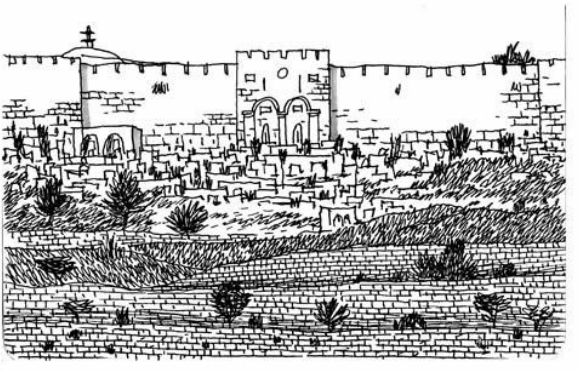

আল্লাহ ﷻ মারইয়াম عليها السلام-এর ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন। অনেক নিয়ামাত দিয়েছেন তাঁকে। নবি ﷺ-এর হাদীস অনুসারে, নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মারইয়াম عليها السلام। তিনি জান্নাতের ওয়াদাপ্রাপ্ত চারজন শ্রেষ্ঠ নারীর একজন। বাকি তিনজন হলেন খাদীজা, আসিয়া ও ফাতিমা। আপনারা জানেন, খাদীজা رضي الله عنها ছিলেন নবিজির স্ত্রী। আসিয়া عليها السلام ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। আর ফাতিমা رضي الله عنها ছিলেন নবিজির মেয়ে।[৪]

[৪] আলিমদের মতে, এই চারজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মারইয়াম عليها السلام, এরপর ফাতিমা رضي الله عنها, এরপর খাদীজা رضي الله عنها আর তারপর আসিয়া عليها السلام; ইবনু আসাকির।

মারইয়াম ﷺ একমাত্র মহিলা যার সন্তানকে তাঁর নামের দিকে যুক্ত করে ডাকা হয়। একজন রাসূলের মা হিসেবে আল্লাহ ﷻ বিশেষভাবে তাঁকে বাছাই করেছেন। মারইয়াম ﷺ-এর পুত্র ঈসা ﷺ ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন। এভাবে আল্লাহ ﷻ মারইয়াম ﷺ-কে অনেক সম্মান দিয়েছেন। মারইয়ামের জন্মের পর তার মা হান্নাহ দুআ করে বলেছিলেন,

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আর অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'[৫]

নবি ﷺ বলেছেন, 'এমন কোনো আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই নবজাতক চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম ﷺ এবং তাঁর ছেলে ঈসা ﷺ এর ব্যতিক্রম।'

তারপর (বর্ণনাকারী) আবূ হুরায়রা ﷺ বললেন, এর কারণ হলো মারইয়াম ﷺ-এর মায়ের এই দুআ-

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'(হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি।'[৬][৭]

আল্লাহ ﷻ হান্নাহ'র দুআ যে কবুল করেছেন, তা এই হাদীস থেকে

[৫] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৬।
[৬] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৬।
[৭] বুখারি, ৩৪৩১।

প্রমাণ হয়। তিনি মারইয়াম ﷺ ও তাঁর বংশধরকে শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন। এই দুআর পুরোটাই কবুল হয়েছে। তাই মারইয়াম ﷺ ও ঈসা ﷺ-এর জন্মের সময় তাঁদের ওপর শয়তানের কোনো প্রভাব ছিল না। যদি তাঁদের আরও কোনো বংশধর থাকত, তাহলে তাদের ওপরেও এই দুআ কার্যকর হতো। কিন্তু এই বংশধারা ঈসা ﷺ-এর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

‘অতঃপর তাঁর রব তা ভালোভাবে কবুল করে নিলেন এবং তাঁকে উত্তমভাবে লালন পালন করলেন। তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।’[৮]

‘ফাতাকাব্বালাহা’ মানে আল্লাহ হান্নাহ’র মানত কবুল করেছেন। আর বাইতুল মাকদিসের খিদমতে মারইয়াম ﷺ-কে নিয়োজিত করেছেন। মারইয়ামের চেহারা ছিল খুবই প্রশান্তিময়। শান্ত ও সৌম্য মুখশ্রী ছিল তাঁর। মারইয়ামের জন্মের পর হান্নাহ তাঁকে নিয়ে গেলেন বাইতুল মাকদিসে। যাতে তিনি সেখানেই বড় হন। তাহলে ইবাদাতগুজার মানুষদের সাথে থেকে তিনিও আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি করতে শিখবেন ও একজন ধার্মিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

‘এ হলো গায়েবি সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহির মাধ্যমে অবগত করেছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব

[৮] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৭।

তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য তারা যখন নিজেদের কলম নিক্ষেপ করেছিল আপনি তখন তাদের কাছে ছিলেন না। এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখন আপনি তাদের কাছে ছিলেন না।'[৯]

মারইয়াম ﷺ-কে নিয়ে বাইতুল মাকদিস পৌঁছালেন হান্নাহ। তার চারপাশে জনতা ভিড় করল। তাদের উদ্দেশ্যে হান্নাহ একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি মানত করেছি এই সন্তানকে বাইতুল মাকদিসের খিদমতে উৎসর্গ করব।'

কিন্তু সন্তান জন্মের পর নারীদের নিফাস চলতে থাকে। এই কারণে হান্নাহ মাসজিদে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। আবার তিনি মারইয়ামকে বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারছিলেন না সেই মানতের কারণে। তাই হান্নাহ এমন কাউকে খুঁজছিলেন যে মারইয়ামের যত্ন নিবে। আর তাঁকে খাদ্য-পানীয়-পোশাক দিয়ে লালন-পালন করে বড় করে তুলবে।

এমন সময় সেখানে এলেন যাকারিয়া ﷺ। তিনি মারইয়াম ﷺ-এর যত্ন নিতে চাইলেন। তিনি ছিলেন একজন নবি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন মারইয়াম ﷺ-এর খালু। আবার কিছু বর্ণনা মতে, তিনি ছিলেন মারইয়ামের বোনের স্বামী। অর্থাৎ, মারইয়াম ﷺ-এর দুলাভাই। আল্লাহ ﷻ-ই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

যাই হোক, অন্যান্য লোকেরাও মারইয়াম ﷺ-কে লালন-পালনের সৌভাগ্য পেতে চাইল। এই নিয়ে বিতর্ক চলতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে ঠিক হলো লটারি করা হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে সে-ই পাবে মারইয়াম ﷺ-কে লালন-পালনের সুযোগ। তাই আগ্রহী ব্যক্তিদের নাম লিখে লটারি করা হলো। এ ধরনের লটারিকে বলা হয়

[৯] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৪৪।

القرعة বা 'কুরআহ'।[১০]

এই বিবাদের মীমাংসা কীভাবে হয়েছিল, তা নিয়ে দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনায় বলা হয়, নদীতে কলম নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঐ কলমগুলো দিয়ে তাওরাত কিতাব লেখা হতো। একটি নাবালক শিশুকে ডেকে আনা হলো। শিশুটি যে কলমটি পছন্দ করবে সেই কলমের মালিককেই দেয়া হবে মারইয়াম ﷺ-এর লালন-পালনের দায়িত্ব। তিনবার এ কাজ করা হলো। প্রতিবারই যাকারিয়া ﷺ-এর কলমটি নির্বাচিত হলো।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নদীতে সবার কলম নিক্ষেপ করার পর বলা হলো, যার কলমটি স্রোতের বিপরীতে যাবে, সে-ই পাবে মারইয়াম ﷺ-কে লালন-পালনের সুযোগ। তিনবার নদীতে কলম নিক্ষেপ করা হলো। প্রতিবারেই যাকারিয়া ﷺ-এর কলম স্রোতের বিপরীতে গেল। ফলে তিনি পেলেন মারইয়াম ﷺ-কে পালনের সুযোগ।

আল্লাহ ﷻ যাকারিয়া ﷺ-কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করলেন। এর কারণ, তিনিই ছিলেন তখনকার মানুষদের মধ্যে

---

[১০] তিনজন নবি লটারি করেছেন বা 'القرعة' করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমজন ছিলেন নবি ইউনুস ﷺ। তিনি যখন অন্যান্য যাত্রীদের সাথে নৌকায় উঠলেন, তখন সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে নৌকাটি ডুবে যেতে লাগল। নৌকার যাত্রীরা বলল, 'মনে হয় কোনো গোলাম তার মনিবের অবাধ্যতা করে পালিয়ে এসেছে। এজন্যই নৌকাটি ডুবে যাচ্ছে!' তাই তারা القرعة বা লটারি করার সিদ্ধান্ত নিল। সব যাত্রীদের নাম লিখে একটি পাত্রে ফেলল। এরপর সেখান থেকে একটি নাম উঠিয়ে নিল। এভাবে তিনবার লটারি করল। দেখা গেল, প্রতিবারেই নবি ইউনুস ﷺ-এর নাম উঠে এসেছে। তাই তারা ইউনুস ﷺ-কে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল। আর সাথে সাথে একটি মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এবং সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে গেল।

القرعة করার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল যাকারিয়া ﷺ-এর ক্ষেত্রে, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

আর তৃতীয় দৃষ্টান্তটি হলো নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর। তিনি কোনো সফরে বের হবার আগে তাঁর পবিত্র বিবিদের নাম লিখে একটি পাত্রে ফেলতেন। এরপর পাত্র থেকে একটি নাম উঠিয়ে নিতেন। যার নাম উঠত, তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন তিনি।

শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাকে নুবুওয়াত দিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিচারে সবার চেয়ে এগিয়ে। ফলে তাঁর কাছে থাকলেই মারইয়াম ﷺ সবচেয়ে বেশি ইবাদাত-বন্দেগি শিখতে পারবেন ও আল্লাহওয়ালা হয়ে বেড়ে উঠতে পারবেন। এ ছাড়া মারইয়াম ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ কিছু কারামাত[১১] ঘটিয়েছিলেন। সেসব কারামাত দেখিয়ে যাকারিয়া ﷺ-কে অনুপ্রাণিত করাও ছিল আল্লাহ ﷻ-এর একটি উদ্দেশ্য।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘যখনই যাকারিয়া মিহরাবের মধ্যে তাঁর (মারইয়ামের) সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তখনই কিছু খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, ‘হে মারইয়াম, এসব তুমি কোথায় পেলে?’ তিনি (মারইয়াম ﷺ) বলতেন, ‘এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন।’[১২]

মিহরাব মানে ইবাদাতের ছোট কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ। এখনকার মাসজিদে ইমাম সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, এটি তেমন মিহরাব নয়। এটি ছিল ব্যক্তিগত ইবাদাতের জন্য নির্মিত ছোট ছোট কক্ষ। এগুলো নির্মাণ করা হতো মাসজিদের ওপর তলায়।

তারা সেসব কক্ষে থাকতেন ও একাকী আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি

[১১] কোনো মুমিন-মুত্তাকী ও আল্লাহর ওলির নিকট থেকে অলৌকিকভাবে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনো কিছু প্রকাশ পাওয়াকে কারামাত বলে।

[১২] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৭।

করতেন। যাকারিয়া ﷺ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছিল না মারইয়াম ﷺ-এর কক্ষে প্রবেশ করার। প্রতিবার মারইয়াম ﷺ-এর কক্ষে এসে যাকারিয়া ﷺ দেখতে পেতেন, মারইয়াম ﷺ-এর সামনে নানা রকমের ফল রাখা। অথচ তখন সেসব ফলের মৌসুম নয়! তাই যাকারিয়া ﷺ প্রশ্ন করতেন, 'মারইয়াম, তুমি এগুলো কোত্থেকে পেলে?'

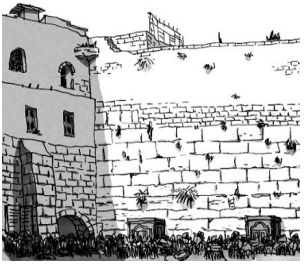

আল্লাহ ﷻ বলেন, 'যখনই যাকারিয়া মিহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, 'মারইয়াম, কোথা থেকে এসব তোমার কাছে আসে?' তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযক দান করেন।'[১৩]

সুতরাং, কোনো মানুষের কাছ থেকে আসেনি এই রিযক। এগুলো এসেছিল আল্লাহর কাছ থেকে। একমাত্র তিনিই পারেন বেহিসাব রিযক দিতে।

মারইয়াম ﷺ-এর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, যেন তাঁর প্রতিও আল্লাহ এমন অনুগ্রহ করেন। যাকারিয়া ﷺ চাইলেন তাঁকে যেন একটি পুত্র-সন্তান

[১৩] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৭।

দেয়া হয়। যে সন্তান যাকারিয়া ﷺ-এর মৃত্যুর পর আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করবে। অর্থাৎ, সে নুবুওয়াত পাবে। আল্লাহ ﷻ সাথে সাথেই এই দুআ কবুল করলেন!

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

‘সেখানেই যাকারিয়া তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’[১৪]

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

‘যখন তিনি কামরার ভেতরে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি হবেন আল্লাহর বাণীর সমর্থক, যিনি হবেন নেতা, চিরকুমার এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত নবি।’[১৫]

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

‘তিনি বললেন, হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও

[১৪] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৮।

[১৫] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৩৯।

বন্ধ্যা। তিনি বললেন, এভাবেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।'[১৬]

এরপর যাকারিয়া ﷺ দুআ কবুলের কিছু নিদর্শন দেখতে চাইলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيٓ آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

'তিনি বললেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে পারবে না। তোমার রবকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করবে।'[১৭]

সুতরাং, আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকারিয়া ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত নিদর্শন ছিল এই যে, সুস্থ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ তিনদিনের জন্য তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। এই তিনদিন তিনি শুধু যিকর করতে পারবেন। তবে কোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। লক্ষ্যণীয়, এই তিনদিন যদিও যাকারিয়া ﷺ কথা বলতে অক্ষম ছিলেন, তবুও তিনি ইশারা-ইঙ্গিতে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নিষেধ করতে থাকেন।

এভাবে সেই নিদর্শন চলে এল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

[১৬] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৪০।
[১৭] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৪১।

‘অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভয়ের সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।’[১৮]

এই উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর বড়ত্ব ফুটে উঠে, আল্লাহ ﷻ চাইলে যেকোনো উপায়ে বান্দাকে সন্তান দিতে পারেন। এর কোনো উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। সন্তান লাভের ব্যাপারটি তিন ভাবে ঘটতে পারে।

প্রথমত, আল্লাহ ﷻ উপযুক্ত মাধ্যম দিয়ে দেন। আর সেই মাধ্যম দিয়ে একজন ব্যক্তি তার বংশ-বিস্তার করে। এক্ষেত্রে একজোড়া সুস্থ নারী-পুরুষের মাধ্যমে সন্তান জন্ম লাভ করে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতেও মাধ্যম থাকে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যেকোনো একজন এই কাজে অপারগ থাকে। যেমনটা হয়েছিল যাকারিয়া ﷺ-এর ক্ষেত্রে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যম থাকে না। এরপরেও আল্লাহ ﷻ চাইলে কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন : ঈসা ﷺ ও আদম ﷺ হলেন এই তৃতীয় ক্ষেত্রের দুটি উদাহরণ।

এজন্যেই আল্লাহর সামর্থের দিকে খেয়াল না করে শুধুমাত্র মাধ্যমের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যাওয়া শিরক। মারইয়াম ﷺ-এর কাহিনির মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে শেখালেন যে, তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। কাজেই সবকিছুর ঊর্ধে গিয়ে আল্লাহর ক্ষমতার ওপরেই ভরসা করা উচিত আমাদের।

[১৮] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯০।

মারইয়াম ﷺ তখন সালাত পড়ছিলেন। এমন সময় একজন ফেরেশতা এসে বললেন,

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

‘আর যখন ফেরেশতা বলল, হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত এবং পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।’[১৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি মারইয়ামের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাকে সমস্ত নারীজাতির মধ্যে মনোনীত করেছেন।

[১৯] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ৪২।

ঈসা عليه السلام-এর জন্ম

সূরা মারইয়ামে ঈসা عليه السلام-এর জন্মের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

‘এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।’[২০]

‘মারইয়াম তার ইবাদাতের কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন জেরুজালেমের পূর্ব দিকে’—এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করে ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما

[২০] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৬।

বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি, কেন খ্রিষ্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কিবলা বানিয়েছে। এর কারণ, মারইয়াম ﷺ গর্ভবতী হওয়ার পর পূর্বদিক চলে গিয়েছিলেন।'

কেন মারইয়াম ﷺ তাঁর মিহরাব ছেড়ে চলে গেলেন, এই সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা আছে। প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর কারণ তাঁর প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর হায়িয শুরু হয়েছিল। তাই তিনি মিহরাবে থাকতে অপারগ ছিলেন। তৃতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি নির্জনতা চাইছিলেন। যেন একাকী আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো একটি বর্ণনাকে এককভাবে বাছাইয়ের সুযোগ নেই। তবে আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হয়, তিনি মানুষের কাছ থেকে নির্জনতা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, এটাই ছিল তাঁর পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

'তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করল। এরপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।'[২১]

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মারইয়াম ﷺ নিজেকে পর্দার আড়ালে ঢেকে নেন। হতে পারে এটা কাপড়ের পর্দা অথবা অন্য কোনোকিছুর পর্দা, যার আড়ালে থাকলে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

কুরআনে আল্লাহ ﷻ 'রূহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'রূহ' মানে আত্মা। এর মাধ্যমে ফেরেশতা জিবরীল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে।

[২১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৭।

তিন কারণে ফেরেশতা জিবরীল ﷺ-কে 'রূহ' বলা হয়।

প্রথমত, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয় নিয়ে আসেন যা মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন। এটা মানুষের রূহের খোরাক। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নিয়ে আসেন।

দ্বিতীয়ত, 'ইয়া রূহি!'- এটি একটি ভালোবাসা-বোধক সম্বোধন। এভাবে আল্লাহ ﷻ তাঁকে আদর-মাখা কণ্ঠে ডেকেছেন। কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয়।

তৃতীয়ত, ফেরেশতা জিবরীল ﷺ এমন একটি আধ্যাত্মিক সত্তা বা 'রূহ', যার মাঝে সকল ভালো ও কল্যাণকর জিনিস আছে। কিন্তু মন্দের লেশমাত্র নেই।

জিবরীল ﷺ মানুষের কাছে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করেন। এটা নির্ভর করে কার কাছে 'ম্যাসেজ' দেয়া হবে তার ওপর। তিনি নবি ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন তাঁর আসল আকৃতিতে। তখন তিনি নবিজি ﷺ-কে বললেন, 'ইক্বরা!' এই বলে তিনি তাঁর একটি ডানা মেলে ধরলেন। এতে পুরো দিগন্ত ঢেকে গেল! এই দৃশ্য দেখে নবিজি এত ভয় পেয়ে গেলেন যে, দৌড়ে বাড়ি চলে এলেন। আর তাঁর স্ত্রী খাদীজাকে বলতে লাগলেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!'

কিন্তু মারইয়াম ﷺ-এর কাছে জিবরীল ﷺ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষের রূপে।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

سَوِيًّا - শব্দের মানে হলো, একজন সুদর্শন পুরুষ।

এখানে আরেকটি বিষয় জেনে রাখা ভালো, যেহেতু মারইয়াম

ﷺ-এর কাছে জিবরীল ﷺ এসেছিলেন—এর ভিত্তিতে কি বলা যায় যে, মারইয়াম ﷺ-কে আল্লাহ নুবুওয়াত দিয়েছিলেন?

এ বিষয়ে দুইটি মতামত আছে। অল্প কয়েকজন আলিম মতামত দিয়েছেন, তিনি নবি ছিলেন। তাই তাঁর কাছে ফেরেশতা জিবরীল ﷺ এসেছিলেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়। উম্মাতের অধিকাংশ আলিমের মতে, মারইয়াম ﷺ নবি ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন 'ওয়ালিয়া' বা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দি।

কারও কাছে ওহি এলেই তিনি নুবুওয়াত পেয়ে যান না। সব ওহিই নুবুওয়াতের ওহি নয়। যেমন: সূরা নাহলের একটি আয়াতে এসেছে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

'আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত করে আদেশ দিলেন, ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যেখানে মাচান তৈরি করে সেখানে ঘর নির্মাণ করো।'[২২]

এখানে ওহি শব্দের অর্থ 'নির্দেশ'। অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ মৌমাছিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং, এই ঘটনা থেকে দলিল পাওয়া গেল, শুধুমাত্র ওহি এলেই কেউ নবি হয়ে যায় না।

আরেকটি কারণে তিনি নবি নন। আল্লাহ কোনো নারীকে নুবুওয়াত দেননি। কারণ একজন নবিকে এমন সব কাজ করতে হয় যা নারীদের জন্য নিরাপদ নয়। যেমন: একজন নবিকে দূর-দূরান্তের অচেনা পথ সফর করতে হয়। বিভিন্ন মানুষের কাছে যেতে হয়। এ ছাড়া শারীরিক কারণে নারীরা বিভিন্ন সময়ে নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত থাকে না। যেমন: হায়িয, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান

[২২] সূরা নাহল, ১৬ : ৬৮।

লালন করা ইত্যাদি। মারইয়াম ﷺ নবি ছিলেন কি না, এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে সূরা মায়িদা-তে। সেখানে মারইয়াম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

অর্থাৎ, ঈসা ﷺ-এর মা ছিলেন একজন সিদ্দিকা।[২৩] সিদ্দিকা শব্দের আক্ষরিক অর্থ সত্যবাদী নারী। তবে পারিভাষিক অর্থ হলো উচ্চপর্যায়ের মুমিনা।

আর "سَوِيًّا" শব্দের মাধ্যমে জিবরীল ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। এই শব্দের মাধ্যমে বোঝা যায় জিবরীল ﷺ-এর চারিত্রিক কোনো ত্রুটি ছিল না কিংবা তিনি দেখতে ভীতিকর ছিলেন না। সকল ফেরেশতাই এমন হয়ে থাকেন।

জিবরীল ﷺ সুদর্শন পুরুষ আকৃতিতে হাজির হয়েছিলেন যেন মারইয়াম ﷺ ভয় না পান। জিবরীল ﷺ-এর আসল আকৃতি দেখলে মারইয়াম ﷺ ভয় পেয়ে যেতেন।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

'মারইয়াম বলল, আল্লাহকে ভয় করো যদি তুমি মুত্তাকী হও, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করছি।'[২৪]

সুদর্শন পুরুষের আকৃতিকে জিবরীল ﷺ-কে দেখে মারইয়াম ﷺ আতঙ্কিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন না, এই অচেনা পুরুষটি কে। সে এখানে কেন এসেছে, কী তার উদ্দেশ্য! কিন্তু তিনি সেভাবেই জবাব দিলেন যা একজন মুত্তাকী নারী দিয়ে থাকেন। 'তুমি

[২৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৫।

[২৪] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৮।

আমার থেকে দূরে থাকো'—এই কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, মারইয়াম ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতেন। যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হয় না স্বতস্ফূর্তভাবে।

আর সেই মুহূর্তে মারইয়াম ﷺ শুধুমাত্র 'আর-রাহমান' নামটি স্মরণ করলেন। অথচ আল্লাহর আরও অনেক গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তিনি 'আর-রাহমান' নামটি স্মরণ করলেন কেন?

'আর-রাহমান' মানে যিনি পরম করুণাময়। সেই মুহূর্তে মারইয়াম ﷺ আল্লাহর শক্তি ও প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা বুঝায় এমন কোনো নাম স্মরণ করেননি। তিনি আল্লাহর কাছে করুণা চেয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুর্বল একাকিনী এক নারী।

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

'সে বলল, আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।'[২৫]

জিবরীল ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন আর বললেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একজন বার্তাবাহক। তাঁর কথা মারইয়াম ﷺ বিশ্বাস করলেন। কারণ মারইয়াম ﷺ তাঁর মাঝে পবিত্রতার লক্ষণ দেখেছিলেন। অথবা অনেকে বলেন, আল্লাহই মারইয়াম ﷺ-এর অন্তরে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, যেন তিনি যুবকের আকৃতিতে থাকা জিবরীল ﷺ-এর কথা বিশ্বাস করেন।

এই আয়াতে তিনি বলেছেন, (لِأَهَبَ لَكِ) বা 'দান করবেন'। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, মারইয়াম ﷺ-কে এমন কিছু দেয়া হবে যার কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করা হয় না। জিবরীল ﷺ মারইয়াম ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন, কারণ আল্লাহ ﷻ মারইয়াম ﷺ-কে

[২৫] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৯।

একটি পুত্র সন্তান দান করবেন!

غُلَامًا زَكِيًّا

সেই পুত্রসন্তানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি হবেন যাকি। যার মানে পবিত্র ও বিশুদ্ধ। তিনি কোনো অবৈধ সন্তান নন।

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

'মারইয়াম বলল, কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?'[২৬]

পুত্র সন্তান হবে—একথা শুনে চমকে উঠলেন মারইয়াম ﷺ! কীভাবে তাঁর পুত্র হবে! কোনো পুরুষ তাঁকে স্পর্শ করেনি, তিনি তো বিবাহিতাও নন! তাঁর এত সুনাম-সম্মান, সব ধুলোয় মিশে যাবে এ কথা ছড়িয়ে পড়লে!

"بَغِيًّا" শব্দের মাধ্যমে বুঝানো হয় বেশ্যাবৃত্তি করে এবং পুরুষের প্রতি লালায়িত নারীকে। মারইয়াম ﷺ দৃঢ়ভাবে বললেন, তিনি এ ধরনের নারী নন।

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

'তিনি (জিবরীল) বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন এবং আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। এটা তো

[২৬] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২০।